সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ

গৌতম রায়

পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ও ভূমি - সংস্কার মন্ত্রী আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা যখন সিঙ্গুরে গিয়ে ঘোষণা করলেন, এই জমি সব সরকারের 'খাস' হয়ে গেল, তখন মনে হল, পুঁজিপতিদের হয়ে মার্কসবাদীরা তো দারুণ কাজ করছেন। পুঁজিপতিরা নিজেরাও এত ভাল পারতেন না। এতদিন রোজ্জাক মোল্লাকে যাঁরা ব্যক্তি মালিকানা থেকে সিলিং বহির্ভূত জমি 'খাস' করে ভূমিহীন কৃষিমজুরদের মধ্যে তা বিলিয়ে দেবার জন্য সওয়াল করতে দেখেছেন, তাঁদের একটু খটকা লাগছিল বটে, কিন্তু রেজ্জাকের মনে কোনও খটকা ছিল না। তাঁর দলের শিল্পমন্ত্রী আর এক মার্কসীয় তাত্ত্বিক নিরুপম সেন তো বলেই দিয়েছেন— বিশ্বায়নের যুগে পুঁজিবাদের অসমাপ্ত বিকাশের কাজ ত্বরান্বিত করাই বঙ্গীয় মার্কসবাদীদের ব্রত। তাই উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি করা নয়, বরং সেই জমি ক্ষতিপূরণের বদলে কেড়ে নিয়ে হাজার একরে কেন্দ্রীভূত করে ব্যক্তিমালিকানাধীন পুঁজির হাতে তুলে দেওয়াই জনস্বার্থ রক্ষার শ্রেষ্ঠ পন্থা। মার্কস নিশ্চয় কবরে পাশ ফিরছেন। তাঁর এক অনুগামী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তো আগেই জানিয়ে দিয়েছেন— আমরা এখানে সমাজতন্ত্র করছি না। ভাগ্যিস বললেন! যেন কেউ বিশ্বাস করত, ওঁরা করছেন!

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় যে ভূমিদস্যুকে 'বাবু' বলে উল্লেখ করেছেন, তিনি তাঁর বাগানখানা কেবল আড়ে - দিঘে সমান করে নিতে উপেনের দু' বিঘে হস্তগত করে নিয়েছিলেন। উপেনের কাতর অনুনয় - বিনয় কোনও কাজে দেয়নি। ভয় দেখিয়ে, মামলা করে উপেনকে তার জমি থেকে উৎখাত করা হয়। আমাদের রতনবাবুরও তেমনি সিঙ্গুরের দুই-তিন ফসলি জমি দেখেই খুব পছন্দ হয়ে যায়। ওখানে সস্তার মোটরগাড়ি বানাবার কারখানা করার খুব শখ জাগে রতনবাবুর। আর যায় কোথা? বুদ্ধদেব-নিরুপম-রেজ্জাক-বিনয় কোঙাররা রতনবাবুর হয়ে মাঠে নেমে পড়লেন। সেই একই পদ্ধতি। ভয় দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে, লোভ দেখিয়ে ছোট - মাঝারি চাষিদের উৎখাতের নীল - নকসা তৈরি হয়ে গেল। বড় চাষি কিংবা ছোট

আসলে সারা জীবন পাড়ার ঘুপচি চায়ের দোকানের ভাঙা বেঞ্চে ভাঁড়ে চা খাওয়ার অভ্যাস। ময়দানি বক্তৃতায় যতই টাটা বিড়লাদের বাপান্ত করুন, সামনে থেকে কখনও দেখেননি। সেই রতন টাটা এসে তাঁদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করবেন, বাপের জন্মে ভাবেননি। তিনি হাতে হাত মিলিয়ে সিঙ্গুরে কারখানা খোলার জমি চাইছেন, এতে কি বিগলিত, বিহ্বল, কাছাখোলা না হয়ে থাকা যায়? বাঙালি কমিউনিস্টরা অতএব খোলা কাছা পিছনে গুঁজতে গুঁজতেই ছুটলেন রতনবাবুর জন্য জমি হাসিল করতে। রতন বাবুকে দালাল- আড়কাঠি - ফড়ে কিছুই লাগাতে হল না।

জোতদারদের নিয়ে সমস্যা ছিল না। এদের অধিকাংশই অকৃষক ভূস্বামী, অন্য খাতে টাকা খাটিয়ে (বাস চালানো, ইঁট-ভাটা, কেরোসিন - কয়লার ডিলারশিপ) ভালই কামাই করছেন, জমির ওপর নির্ভরশীলও নন, উপরন্তু বর্গাদার দিয়ে চাষ করান। কারও জমি ৯২ বিঘে, কারও কিছু কম। ক্ষতিপূরণ বাবদ বেশ কয়েক কোটি টাকা মুফতে আমদানি হয়ে যাবে, বর্গার ঝামেলা থেকেও রেহাই মিলবে। তাই 'স্বেচ্ছায় জমি দিতে' ওঁরা লাইন লাগালেন। আর ওঁদের দেখিয়েই বামপন্থী মন্ত্রীরা, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার নেতারা বলতে লাগলেন— এই তো সবাই জমি ছেড়ে দিচ্ছে। জমি থেকে আর কী বা আয় হয়? হিসেবপত্র দেখিয়ে সে সব বুঝিয়েও দিলেন। যারা আপত্তি করছে, তাদের ষড়যন্ত্রকারী, দক্ষিণপন্থী, ছদ্ম কৃষক— এ সবও বললেন।

লক্ষ্য করুন, রতনবাবু কিন্তু চুপচাপ বসে রইলেন। কোনও মন্তব্য নয়। বণিকসভার তরফে সংশয় ব্যক্ত হলে বুদ্ধদেব - নিরুপম হাতে - পায়ে ধরে পুঁজিপতিদের আশ্বস্ত করেন — এ রাজ্যকে শিল্পের মরুভূমি করে দেবেন না! সিঙ্গরের কৃষকদের তিরস্কার করলেন — সামান্য জমির জন্য রাজ্যের শিল্পায়ন, উন্নয়ন বন্ধ করে দেবেন? ছিঃ! তাতে ফল না হওয়ায় ক্যাডার এবং পুলিশ (প্রায়শ যা এক এবং অভিন্ন) ব্যবহারের হুমকিও দিয়ে রাখলেন। আসলে সারা জীবন পাড়ায় ঘুপচি চায়ের দোকানের ভাঙা বেঞ্চে ভাঁড়ে চা খাওয়ার অভ্যাস। ময়দানি বক্তৃতায় যতটা টাটা বিড়লাদের বাপান্ত করুন, সামনে থেকে কখনও দেখেননি। সেই রতন টাটা এসে তাঁদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করবেন, বাপের জন্মে ভাবেননি। তিনি হাতে হাত মিলিয়ে সিঙ্গুরে কারখানা খোলার জমি চাইছেন, এতে কি বিগলিত, বিহ্বল, কাছাখোলা না হয়ে থাকা যায়? বাঙালি কমিউনিস্টরা অতএব খোলা কাছা পিছনে গুঁজতে গুঁজতেই ছুটলেন রতনবাবুর জন্য জমি হাসিল করতে। রতনবাবুকে দালাল - আড়কাঠি - ফড়ে কিছুই লাগাতে হল না। পাইক বরকন্দাজও জোগাড় করতে হল না। কারণ মার্কসবাদী কমিউনিস্টরাই এই ভূমিকাগুলো পালন করতে এগিয়ে এলেন। তাঁরা কেউ একবারের জন্যও উর্বর কৃষিজমি নষ্ট করার প্রসঙ্গ তুললেন না, মোটরগাড়ি কারখানার জন্য অত জমি কী হবে, জানতে চাইলেন না, সিঙ্গুরের বদলে পুরুলিয়া - বীরভূমের ঊষর প্রান্তরে পড়ে থাকা হাজার হাজার জমি দেখিয়ে বিকল্পের সুপারিশ করলেন না। পাছে রতনবাবু অন্য রাজ্যে কারখানা খুলতে চলে যান! অন্যরা এই সব প্রশ্ন তুললে এই পরম কৃষকহিতৈষীরা তাদের 'উন্নয়নের শত্রু' বলে গাল দিলেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন অধিগ্রহণের জন্য চিহ্নিত সিঙ্গুরের জমিতে আমন ধানের চারা রোপণ করে প্রতীকী প্রতিবাদ জানালেন, তখন বিমান বসুরা সেটাকে তামাসা বলে বিদ্রূপ করেন। মমতা কিন্তু পাল্টা বিদ্রূপের ব্যঞ্জনায় ইতিহাসের এক নির্মম পরিহাসের দিকে ইঙ্গিত করেন, যখন তিনি কৃষক জনসভায় তেভাগা - তেলেঙ্গানা - কাকদ্বীপের আন্দোলনের কথা মনে করিয়ে দেন এবং হেমন্ত মুখোপাধ্যায় - সলিল চৌধুরিদের গাওয়া গণসঙ্গীত 'তৃণমূলী কৃষক'দের গাইতে বলেন। সেই সব গানেই কাস্তেতে শান দেওয়ার কতা, ফসল ঘরে তোলার কথা, নবান্নের কথা, 'লাঙল যার জমি তার' স্লোগানের কথা,

জমি শুধু ফসল দেয় না, জ্বালানি দেয়, গৃহপালিত গরু ছাগলদের ঘাস পাতার জোগান দেয়, বর্ষায় ভরাট জমিতে ধানগাছের ফাঁকে ফাঁকে উপচে - যাওয়া খাল বিলের মাছের ঝাঁক অপেক্ষা করে ঘুনি মুগ্‌রির ফাঁদে কিংবা জাওলার বঁড়শিতে ধরা পড়বে বলে। মাছরাঙা থেকে শুরু করে জমির আলে ধ্যানস্থ তপস্বী বক, উজাড় ক্ষেতে নেমে আসা মাঠচড়াইয়ের ঝাঁক, অসংখ্য পাখি, ফুল, ফল, আর রকমারি জলজ মিলে রচনা করে যে জীববৈচিত্র্য, তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে থাকে কৃষকের জীবন ও সমাজ।

কৃষকদের অধিকারের প্রতিবাদের - প্রতিরোধের কথা উচ্চারিত হত। আজ সেই কথাগুলিই বলার জন্য মার্কসবাদীরা মারতে তেড়ে আসছেন, ক্যাডার পুলিশ লেলিয়ে দিচ্ছেন, চাষিদের ওপর লাঠিচার্জ চলছে, অচিরেই হয়তো গুলিও চলবে। কারণ বুদ্ধদেব থেকে রেজ্জাক মোল্লা, সকলেরই অঙ্গীকার— রতনবাবুর কারখানা সিঙ্গুরেই হবে। হবেই হবে। সে জন্য যদি কৃষক মারতে হয়, মারব। বিরোধীদের জেলে পুরতে হয়, পুরব। বস্তুত গত ২৫ সেপ্টেম্বর মধ্যরাতে বামফ্রন্টের পুলিশ ঠিক এই কাজটাই করে দেখায়। স্বরাষ্ট্র সচিবের আগাম প্রতিশ্রুতি ছিল, কৃষক দের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করা হবে না। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন দলীয় সহকর্মীদের নিয়ে সিঙ্গুরের বিডিও অফিসের সামনে ধর্নায় বসেছিলেন,

তখন তাঁকে পাঁজাকোলা করে, চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে পুলিশের জিপে তোলা হয় এবং রাতের অন্ধকারেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। এরপরই শুরু হয় পুলিশের বেপরোয়া ও বেধড়ক লাঠিচার্জ, শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে লুটিয়ে পড়ে আন্দোলনকারী কৃষক ও তাদের পরিবারের লোকেরা। দু মাসের শিশু থেকে আশি বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলকেই গ্রেপ্তার করা হয়। নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক থেকে বেরিয়ে এসে বিমান বসু জানান, যারা বামফ্রন্টের শিল্পায়ন নীতির বিরোধিতা করছে। তাদের চুলের মুঠি ধরেই রাজ্য থেকে বের করে দেওয়া উচিত। বামফ্রন্টেরই তিন শরিক দল ফরওয়ার্ড ব্লক, আর এস পি এবং সি পি আই বড় তরফ সি পি এমের উপর তাদের নির্ভরশীলতা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনে এ ভাবে পুলিশ পাঠানো এবং লাঠিচার্জ করার বিরোধিতা করেছে। মমতার সঙ্গে পুলিশের অসৌজন্যমূলক আচরণ ও দুর্ব্যবহারেরও বিরোধিতা করেছে কোনও কোনও শরিক। তবে বিধানসভায় নির্বাচনে দুই - দৃতীয়াংশেরও বেশি গরিষ্ঠতা পাওয়া সি পি এম শরিকদের এই গণতন্ত্রপ্রেম নিয়ে আদৌ ভাবিত নয়।

কৃষক তো আসলে স্রষ্টা

একটা বিষয় এই ঘটনাক্রমে পরিষ্কার হয়ে গেছে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির এই নেতা কর্মীরা — বিনয় কোঙার, আবদুর রেজ্জাক মোল্লা, নিরুপম সেন, সমর বাওরা প্রমুখ— কোনওদিন কেউ কৃষক ছিলেন না। এঁরা সকলেই অকৃষক ভূস্বামী, যাঁরা শ্রেণিগতভাবে কার্যত জমিদার গোত্রভুক্ত। নিজেরা কৃষক হলে কখনও বলতে পারতেন না, 'চাষার ছেলে কি সারা জীবন চাষাই হবে?' কিংবা 'চাষে যা লাভ, তার চেয়ে অনেক বেশি লাভ কৃষিজ জমির ক্ষতিপূরণের টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখে মাসে মাসে তাদের সুদ খাওয়া', কিংবা 'চাষি বিনিয়োগকারী কারখানায় কাজ পাবে না বটে, তবে ইমারতে মিস্ত্রির 'জোগাড়ে'র কাজ পাবে, আবাসনে ধোপা, নাপিত, দারোয়ান, চৌকিদার হতে পারবে, চায়ের দোকান দিতে পারবে' ইত্যাদি। নিজেরা কৃষক হলে এ ভাবে তার বৃত্তি পরিবর্তনের জন্য নির্লজ্জ সওয়াল করতে তাঁদের বাধতো। জীবিকা অত সহজে পাল্টানো যায় না। ভারতীয় সমাজে, যেখানে সমাজই বংশ পরম্পরায় জীবিকা নির্ধারণ করে দিয়েছে, জীবিকাচ্যুত হলে যে সমাজে জাতিচ্যুতও হতে হয়, সেখানে কৃষককে নাপিত, চৌকিদার, ধোপা বা চা-দোকানি হতে বলার মধ্যে রয়েছে তীব্র অসংবেদী হৃদয়হীনতা, রাজ্যের শিল্পায়ন বা উন্নয়নের বৃহত্তর স্বার্থের দোহাই দিয়েও যা অনুশীলন করা লজ্জাকর।

যদি বলা হয়, চাষির দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেয়ে চা-দোকানি বা ফুটপাতের হকারের সচ্ছলতায় উত্তরণের সুযোগ কৃষকরা কেন নেবে না, তবে তার উত্তর হল, না নেবার স্বাধীনতাই গণতন্ত্রে ব্যক্তির পছন্দের স্বাধীনতা। কোনও কৃষিজীবীকে জোর করে সুদখোরে পরিণত করার নৈতিকতাই বা সরকারকে, শাসক দলকে কে দিল? তা ছাড়া, জমি কি কৃষক কেবল চাষ করে? জমি তার সব, তার মা। এটা আবেগের কথা নয়, জীবনসত্যের কথা। এই জমি তার বাপ ঠাকুর্দার জীবন বাঁচিয়েছে। তার ফসল বেচে গেরস্তালির তৈজসপত্রের খরচ ওঠে। লৌকিকতা - কুটুম্বিতা হয়। চাষের ওই জমিটুকু ঘিরেই গড়ে ওঠে ছায়া সুনিবিড় জনপদ, বাস্তু, ভিটা,উপেনের মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাই বলান, 'সপ্ত পুরুষ যেথায় মানুষ সে-মাটি সোনার বাড়া/ দৈন্যের দায়ে বেচিব সে-মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া?' এই লক্ষ্মী কেবল নবান্নের সুবাসের লক্ষ্মী নয়, এর সঙ্গে গোটা গ্রামসমাজ ও তার জীবনের দৈনন্দিনতা জড়িয়ে রয়েছে। তাই হারানো জমির কাছে ফিরে এসে 'বিদীর্ণ হিয়া' উপেনের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। মনে পড়ে যায় 'বালক - কালের কথা'। জৈষ্ঠ্যের ঝড়ে আম-কুড়াবার ধুম, স্তব্ধ দুপুরে পাঠশালা - পলায়নের মধুর ব্যথাকাতর স্মৃতি। কৃষকের স্বপ্ন দিয়েই তো তৈরি, তার স্মৃতি দিয়ে তো ঘেরা ধন্যধান্যপুষ্পভরা এই বসুন্ধরা। তার আদিগন্ত হরিৎক্ষেত্র, এই শারদ প্রকৃতির অনুপম সুষমা ও বৈচিত্র্য তো কৃষি সমাজেরই উত্তরাধিকার। শুভেন্দু দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁর একটি সাম্প্রতিক নিবন্ধে ('ওদের ক্ষমতা, আমাদের তর্ক') বিষয়টিকে বিস্তৃততর করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'খেয়াল করা হয় না, একটা জায়গায় একজন মানুষ জন্মায়, বড় হয়, খেলাধূলা করে, মেলামেশা করে, সমাজ গড়ে তোলে, সংস্কৃতি গড়ে তোলে, সখ্য তৈরি হয়, স্বপ্ন দেখে, স্মৃতি তৈরি হয়। সেই মানুষকে তার জায়গা থেকে উচ্ছেদ করলে তার যে ক্ষতি হয়, তা পূরণ করা যায়? এ সবের দাম হয়? তাকে অন্য জায়গায় সরিয়ে দিয়ে এই সব ফিরিয়ে দেওয়া যায়?...কৃষক তো আসলে স্রষ্টা শিল্পী। যে মাটি চেনে, আবহাওয়া চেনে, বীজ চেনে, পোকা চেনে, সার জানে, আগাছা জানে, কী করে শস্য ফলে, বাড়ে, বাঁচে, পাকে, কখন কাটতে হয়, তুলতে হয়, রাখতে হয়, এ রকম অনেক জ্ঞান, ব্যক্তিজ্ঞান, গোষ্ঠীজ্ঞান, সামাজিক জ্ঞান চলে আসছে পরীক্ষা, অনুসন্ধান, নিরীক্ষা, আলোচনা, বিনিময়, প্রয়োগ এ সবের মধ্য দিয়ে, যা একটা অমূল্য সম্পদ হয়ে ওঠে। মানুষ স্রষ্টা, শিল্পী হয়ে ওঠে, আনন্দ পায়, বেঁচে থাকার মানে খুঁজে পায়, অবদান রাখে। এই বার এই কৃষককে তার জমি থেকে , সৃষ্টি থেকে, তার জান থেকে, তার অবদান থেকে, তার বেঁচে থাকার আনন্দ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল, তার সৃষ্টির ভূমি কেড়ে নেওয়া হল। নিয়ে বলা হল, কেন কী হয়েছে, আমরা তো তাকে কাজ দিচ্ছি।' ঝাড়ুদার কিংবা দারোয়ান কিংবা দোকানদার কিংবা ঠিকা শ্রমিকের কাজ, যা তার সৃষ্টি, জ্ঞান ও আনন্দের জগৎ থেকে তাকে নির্বাসিত করে।

জমি শুধু ফসল দেয় না, জ্বালানি দেয়, গৃহপালিত গরু ছাগলদের ঘাস পাতার জোগান দেয়, বর্ষায় ভরাট জমি ধানগাছের ফাঁকে ফাঁকে উপচে - যাওয়া খাল বিলের মাছের ঝাঁক অপেক্ষা করে ঘুনি - মুগ্‌রির ফাঁদে কিংবা জাওলার বঁড়শিতে ধরা পড়বে বলে। মাছরাঙা থেকে শুরু করে জমির আলে ধ্যানস্থ তপস্বী বক, উজাড় ক্ষেতে নেমে আসা মাঠচড়াইয়ের ঝাঁক, অসংখ্য পাখি, ফুল, ফল, আর রকমারি জলজ মিলে রচনা করে যে জীববৈচিত্র্য, তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে থাকে কৃষককের জীবন ও সমাজ। এক খণ্ড কৃষিজমি মানে কেবল সেই জমিতে চাষ করা ফসল নয়, চাষ-না-করা ফসল, শাক, অন্যান্য খাদ্য, মাছ - কাঁকড়া-গুগলি - গেঁড়ি, ম্যালেরিয়া পাতা, পঙ্কাশিরের মতো ঔষধি গাছ- গাছড়া। রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার সত্ত্বেও সে জমিতে ঘোরে ব্যাঙ, কেঁচো, সাপ, ইঁদুর যা প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে। থাকে এমন সব উপাদান (খড়ের নাড়া, শুকনো লতাপাতা) যা ঘর বানাতে, চাল ছাইতে রকমারি কুটির শিল্প বানাতে কাজে লাগে। আর সেই জমির

নিচে থাকে অফুরন্ত জলের ভাণ্ডার, শ্যালো বা ডিপ টিউবওয়েলের ব্যাপক ব্যবহারেও যা এখনও নিঃশেষিত নয়। কৃষি জমি থেকে রসদ নিয়ে যে গ্রামীণ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প বেঁচে থাকে, বিকশিত হয়, যে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প নিজে থেকেই গড়ে ওঠে, তারই বা কি পরিণতি হবে? রতনবাবুর মোটর কারখানা সে সব ধ্বংস করেই উন্নয়ন ঘটাবে।

সেই উন্নয়নের ফল যে চাষিরা বিশেষ পাবে না, তার প্রমাণ ইতিমধ্যেই মিলতে শুরু করেছে। সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক চাষিরা প্রায় সকলেই বর্গাদার। অথচ তাঁদের অধিকাংশের নামই সেটেলমেন্ট রেকর্ডে নথিভুক্ত নয়। যার অর্থ, ক্ষতিপুরণ বাবাদ জমি মালিকের পাশাপাশি বর্গাদারেও যেটুকু প্রাপ্য হয়, তারা তা পাবেন না। এই ভয়াবহ বঞ্চনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে কৃষকসভার নেতা বিনয় কোঙার বলেছেন, 'পাবে কেন? কেন তারা এত দিন বর্গা রেকর্ড করায়নি? ঘুমোচ্ছিল?' চমৎকার। কোথায় বিনয় কোঙারকে প্রশ্ন করা হবে, এত কাল যে বামফ্রন্ট অপারেশন বর্গাকে (অর্থাৎ বর্গা রেকর্ড আন্দোলনকে) তার সফল ভূমি সংস্কারের স্তম্ভ বলে দাবি করে এসেছে, সেই দাবিটা তাহলে ভুয়ো? বর্গাদারদের নথিভুক্ত করবার দায়িত্ব ছিল, আর কৃষকসভার দায় ছিল না সেটেলমেন্ট অফিসে বর্গাদারদের নিয়ে যাবার? এতকাল ধরে ঘুমোচ্ছিল কারা? বর্গাদাররা, নাকি তাদের ব্যবহার করে যারা কৃষক নেতা হয়ে পলিটব্যুরোয় ঢোকার জন্য অধৈর্য হয়ে উঠেছেন, সেই বিনয় কোঙাররা? বর্গাদারদের নতুন করে প্রতারিত করার যুক্তি হিসাবে তাঁরা বঞ্চিতদেরই দুষছেন? বলা হয়, এক কান কাটাদের কিছুটা লাজলজ্জা থাকে বলে তারা জনপদের বাইরের দিয়ে যায়, কিন্তু দু -কান কাটারা সম্পূর্ণ লজ্জাহীন ও সঙ্কোচরহিত হওয়ায় শহরের প্রধান রাজপথ দিয়েই মাথা উঁচু করে হাঁটে। বিনয় কোঙার, নিরুপম সেনরা যে শেষোক্ত গোত্রে পড়বেন, তাতে সন্দেহ নেই।

সিঙ্গুর উন্নততর বামফ্রন্ট ও তার বুদ্ধ-নীতির পরীক্ষাকেন্দ্র। এখানেই যাচাই করে নেওয়া হচ্ছে ব্যক্তিমালিকানাধীন, দেশি বিদেশি একচেটিয়া ও বহুজাতিক পুঁজির লগ্নিক্ষেত্র হিসাবে মার্কসবাদী- শাসিত পশ্চিমবঙ্গ অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে উপযুক্ততর কিনা। সিঙ্গুরের 'সাফল্য'র দিকে অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে আম্বানি ভ্রাতৃদ্বয়, ইন্দোনেশিয়ার সালিম সাপুত্রা, মার্কিন বহুজাতিক পুঁজির সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। তাই সিঙ্গুরে জমির অধিগ্রহণ নিয়ে বাম নেতা মন্ত্রীদের এত অনমনীয় জেদ, এমন অন্ধ প্রতিবিপ্লবী আবেগ, এত প্রতিক্রিয়াশীল দমননীতি। এ রাজ্যের সব মার্কসবাদী নেতাই এখন লেগে পড়েছেন পুঁজিপতিদের বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত জমির খোঁজে। এ জন্য প্রায় 'আগে কে বা প্রাণ করিবেক দান, তারি লাগি কাড়াকাড়ি।' রেজ্জাক মোল্লা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় জমি অশোক ভট্টাচার্য কোচবিহার - আলিপুরদুয়ার - শিলিগুড়িতে, বিনয় কোঙার বর্ধমানে। দু' বছর মধ্যেই নাকি সম্পূর্ণ হয়ে যাবে এ রাজ্যের 'ল্যান্ড ম্যাপ', বিনিয়োগকারীদের সুবিধার্থে। তারপর যে বিনিয়োগকারী ব্যক্তিগত ও দলগত স্তরে শাসক বামপন্থীদের যত খুসি করতে পারবেন, তার জন্য তত সুবিধাজনক শর্তে জমি ধার্য হবে। সে জন্য বিনিয়োগকারীদের মধ্যে প্রকাশ্য প্রতিযোগিতার স্বচ্ছতারও প্রয়োজন নেই। ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্টপ্রেমী বেওসায়ী সালিম সাপুত্রাকে দেওয়া ওয়েস্ট ক্যালকাটা উপনগরী বা রকমারি প্রকল্পের জমির জন্য কি কোনও টেন্ডার ডাকা হয়েছিল? রতনবাবুকে যে সিঙ্গুর দেওয়া হচ্ছে, তারও কি অন্য দাবিদার কেউ ছিল, যার সঙ্গে দর কষাকষি করা যেত, করে প্রাপ্য টাকা বাড়িয়ে নেওয়া যায়, যাতে উৎখাত হওয়া চাষিদের জন্য তা খরচ করা যাবে? সে সব প্রশ্ন ওঠে না। ও সব অ-মার্কসবাদী, অ-বাম রাজ্যের জন্য। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ কোনও প্রতিযোগিতা বরদাস্ত করে না, স্বচ্ছতাও না। অবাধ প্রতিযোগিতা মানেই তো...। যাক গে! তাই এ রাজ্যে সরকার কোনও প্রকল্প স্থির করে তার জন্য আন্তর্জাতিক টেণ্ডার ডাকবে, এমন বন্দোবস্ত চালু করা হয়নি। এখানে বিনিয়োগকারী আসবেন, নির্বাচিত গণতান্ত্রক নেতৃত্ব অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়ে আব্দার করবেন, তাঁর অমুক জায়গায় জমি চাই। মুখ্যমন্ত্রী সায় দিলেই প্রকল্প মঞ্জুর হয়ে গেল।

এ ভাবেই ছ' মাসে তেতাল্লিশ হাজার একর কৃষিজমি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিতে কৃষকসভায় নেতা বিনয় কোঙার এখন গ্রাম বাংলায় দাপিয়ে সভা করছেন। কৃষকদের 'প্রকৃত শত্রু' কে তা উন্মোচিত করাই নাকি তাঁর উদ্দেশ্য। শিল্পপতিদের উপর যদি বেশি শর্ত আরোপ করা হয়, তাহলে নাকি তাঁরা গোঁসা করে অন্য রাজ্যে চলে যাবেন। তাতে রাজ্যের সমূহ ক্ষতি হয়ে যায়। অতএব প্রাণ থাকতে বিনয়বাবু তা হতে দেবেন না অর্থাৎ রতনবাবুদের অন্য রাজ্যে চলে যেতে দেবেন না। তাঁরই সতীর্থ সমর বাওরার ধারণা— বিনিয়োগকারীরা তাঁদের পছন্দমতো জায়গায় পছন্দমতো শর্তে কারখানা খুলবেন, স্বাস্থ্যনগরী বানাবেন। আমরা তাঁদের বলতে পারি না, কোথায় করবেন। কেন পারি না? এই রাজ্যটা, এর মাঠ - ঘাট - আকাশ - জল কি লগ্নিকারীদের বাপের জমিদারী? তাঁরা যা বলবেন, যেমন ভাবে বলবেন, তা-ই করতে হবে? রাজ্যের রাজ্যবাসীর স্বার্থই যদি এই নেতা মন্ত্রীদের অগ্রাধিকার পায়, তবে কেন বিনিয়োগকারীদের সেই অনুযায়ী চালিত করা যাবে না? কেনই বা বন্ধ কারখানার জমি কিংবা পুরুলিয়া - বাঁকুড়ার উষর ফাঁকা জমি ব্যবহার করা, এমনকী বিনিয়োগকারীদের ঘুরিয়ে দেখানোর চেষ্টা পর্যন্ত হবে না?

কারণ, রতনবাবুদের ফিরে যাওয়ার ভয়। যেন রতনবাবু কিংবা সালিম সাপুত্রার এ রাজ্যে বিনিয়োগে কোনও স্বার্থই নেই, নেই কোনও মুনাফার সম্ভাবনাও। ওঁরা এমনি এমনি রাজ্যের গরিব চাষিদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য টাকার ঝুড়ি নিয়ে হাজির। যেন পুঁজির ধর্মই শ্রমজীবীর শোষণ নয়, সামাজিক দায়বোধ থেকেই রতনবাবুরা লগ্নি করতে চাইছেন। তাই তাদের চটানো যাবে না, এমনকী অসন্তুষ্টও করা উচিত নয়। কেননা তাহলে তাঁরা অন্য রাজ্যে গরিব চাষি ও বর্গাদারদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলাতে চলে যেতে পারেন। তাতে এ রাজ্যের চাষিদের ক্ষতি। মহাক্ষতি।

কৃষকদের কৃষিজমি থেকে উচ্ছেদ করলে কী মহালাভ হয়, তার দৃষ্টান্ত সামনেই রয়েছে— রাজারহাট। সেখানে হাজার হাজার একর কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে বড়লোকদের নিউ টাউন গড়ে তোলা হচ্ছে (সলপ - ডানকুনিতে সালিম যেমন ওয়েস্ট ক্যালকাটা ইন্টারন্যাশনাস সিটি গড়ছেন, যার আবাসনের একটি ফ্ল্যাটের দাম পড়বে বেশি নয় মাত্র দেড় কোটি টাকা)। এখানে তিন বিঘে জমির জন্য চূড়ামণি নস্কর ক্ষতিপূরণ পান ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। ওই জমির জন্যই আজিম প্রেমজির উইপ্রোকে বামফ্রন্ট সকরার দর দেয় ২ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা, দরাদরি করে প্রেমজি নামিয়েন ১ কোটি ৮১ লক্ষে। জমির ভরাট বা উঁচু করা, রাস্তা তৈরি, নিকাশি বন্দোবস্ত, জল - আলো ইত্যাদি প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ব্যবস্থা করতে খুব বেশি হলে যদি ২৫ লক্ষ টাকা খরচ হয় তাহলেও সরকার ওই তিন বিঘে বেচে লাভ করছে দেড় কোটি টাকা। এটাই তার মানে ওই জমির বাজার দর। চূড়ামণি নস্কররা কিন্তু পেল তাই দুই শতাংশেরও কম। অর্থাৎ বামফ্রন্ট সরকার এখানে চরম মুনাফাখোর জমির দালালের ভুমিকায় সরাসরি অবতীর্ণ। তা গরিব চাষির জমির বিনিময়ে যদি সরকারের কোষাগার বাড়ে, বাড়ুক। কিন্তু চুড়ামণিদের কী হল? বাস্তুচ্যুত, জীবিকাচ্যুত চুড়ামণি এখন নির্মীয়মান উপনগরীর মজুরদের জন্য চায়ের দোকান দিয়ে কোনও মতে সংসার

চালান। অর্থাৎ, ঠিক রেজ্জাক মোল্লা বা বিনয় কোঙাররা যা চেয়েছিলেন। রাজাহাটেরই কাসেম গাজির হাতে এখন মোবাইল ফোন। নগরায়নের জন্য বেচে ওর পরিবার দু লক্ষ টাকা পেয়েছিল। এত দিনের পর সাকুল্যে আর হাজার পঞ্চাশেক পড়ে আছে। ঘটির জল গড়িয়ে খেতে খেতে কত দিন আর থাকবে? বছর পাঁচেকের মধ্যে কাসেমরা ওই উপনগরীর কেপমারের ভিড়ে নাম লেখালে অবাক হব না। অভাবের তাড়নায় ওর বোন বা বউদি নিউ টাউনের ফ্ল্যাট মালিকদের বাসনও মাজতে পারে, কিংবা বাবুদের যৌনক্ষুধা মেটাতে সন্ধ্যার আবছা আলোয় নিরালা ফুটপাতেও দাঁড়াতে পারে। কৃষিজমি যত দিন ছিল, কাসেম বা চূড়ামণিদের এই বিপর্যয়কর ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হতে হয়নি।

সরকার অর্থাৎ রাজ্যের রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ যখন রতনবাবুদের খুশি করতে মরিয়া, তখন সরকারি প্রশাসনযন্ত্র যে সর্বশক্তি নিয়ে কৃষিজমি অধিগ্রহণে ঝাঁপিয়ে পড়বে, অধিগ্রহণ - বিরোধীদের তাড়া করবে, সভা করতে দেবে না, মুখ খুলতে দেবে না, এটা অস্বাভাবিক নয়। কেননা নামে গণতন্ত্র হলেও ধনিকশ্রেণীর এই গণতন্ত্র শ্রমজীবী মানুষের অধিকার খর্ব করার এবং ধনিকদের যথেচ্ছাচার কায়েম করারই গণতন্ত্র। অধুনা কথায় কথায় লেনিনকে উদ্ধৃত করার রেওয়াজ নেই। তবু এমন অনেক মূল্যবান কথা লেলিনই বলেছিলেন। বুঝিয়েছিলেন, অবাধ, অপ্রতিহত, নিরঙ্কুশ বা অনাপেক্ষিক গণতন্ত্র বলে কিছু হয় না। হয় ধনিক শ্রেণির (বুর্জোয়া) গণতন্ত্র, নতুবা শ্রমজীবীদের গণতন্ত্র (প্রোলেতারিয়ান ডেমোক্রেসি)। ভারতে যে প্রথমটি কায়েম রয়েছে এবং কমিউনিস্ট নামধারী কোনও দলের যোগদানও যে সেই গণতন্ত্রের বুর্জোয়া চরিত্রটি পাল্টাতে পারে না, একথাও মার্কসবাদের প্রথম পাঠ। তাই 'সীমিত ক্ষমতায় জনসাধারণকে ন্যূনতম রিলিফ দেওয়া'র প্রতারণা ঝেড়ে ফেলে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য - নিরুপম সেনরা যে সরাসরি 'সমাজতন্ত্র করছি না' কিংবা 'পুঁজিবাদের অসমাপ্ত বিকাশ সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করছি' বলছেন, সেটা এক দিক থেকে মন্দের ভাল। নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব তথা কৃষি বিপ্লবের লোকঠকানো শ্লোগান বা কর্মসূচি থেকে ক্যাডারবাহিনী ও সমর্থককুলকে সরিয়ে এনে দলীয় কর্মসূচী রূপায়ণের (এ ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলে কৃষক এবং শহরাঞ্চলে গরিব অসংগঠিত শ্রমজীবীদের উচ্ছেদ করে সেখানে রতন - সালিম - আম্বানি - প্রেমজিদের উচ্চবিত্ত কল্পসভ্যতার বসত করানোর) উপযোগী দক্ষ, মারকুটে, ফ্যাসিস্ট ঝটিকাবাহিনীতে পরিণত করার নীতিতে অন্তত আত্মপ্রতারণা বা তঞ্চকতা নেই। দস্যু, লঠেরা বা ঠাঙাড়ে হিসাবেও বুদ্ধ - নিরুপমদের অন্তত পর্যাপ্ত ও ঈর্ষণীয় সততা রয়েছে। সিঙ্গুর শব্দটি মুখে উচ্চারণ করলেই ওঁদের বাহিনী টুঁটি টিপে ধরার জন্য প্রস্তুত হলে তাই বলার কিছু নেই।

মিডিয়ার রূপ

কিন্তু শাসকদের দালাল হিসাবে গণমাধ্যমের ভূমিকায় এবং বাম ও মধ্যপন্থী বুদ্ধিজীবীদের নীরবতায় এখনও কেউ কেউ অবাক হতে ভোলেন না। 'কেন যে তা, কে বা জানে'? বাংলায় প্রকাশিত দুটি সংবাদপত্র ছাড়া এ রাজ্যের আর সব কাগজেই সিঙ্গুরি কাণ্ড বা অপকাণ্ডের সবিস্তার প্রতিবেদন ছাপা হয়ে চলেছে। কিন্তু ওই দুই সংবাদপত্রেই নিয়মিত সিঙ্গুর বিষয়ক খবর সেন্সর করার প্রাণ প্রাত্যহিকা। কিংবা এমনভাবে তা পরিবেশিত হচ্ছে, যা সম্পাদকের অভিপ্রায় বা 'মতামত' কেউ প্রতিফলিত করছে, প্রতিবেদকের 'অভিজ্ঞতা'কে নয়। সরকারের কোনও বিশেষ নীতির প্রতি সংবাদপত্র মালিকদের পক্ষপাত বা বিরূপতা থাকতেই পারে। কিন্তু সে জন্য সংবাদ পরিবেশন পক্ষপাতদুষ্ট হবে কেন? নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের দায় কি গণমাধ্যমের একান্ত দায় নয়? কোনও অপছন্দের সংবাদকে পাঠকদের কাছে পৌঁছতে না দেওয়ার যে সেন্সরশিপ, তা কি এক হিসাবে পাঠকের অধিকারকে খর্ব করে না? তবে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সংবাদপত্র মালিকরাও অন্যান্য পুঁজিপতিদের মতোই পুঁজির স্বার্থই দেখবেন, এটা ধরে নেওয়াই উচিত। যদি কোনও নির্বাচিত সরকার সেই স্বার্থকে ভালভাবে সিদ্ধ করতে না পারে, তাহলে সেই সরকারের বিরোধিতায় সংবাদপত্র মুখর হতেই পারে। তাতে ধরে নেওয়া ঠিক নয় যে জুৎসই বিরোধী পক্ষের অনুপস্থিতিতে সংবাদপত্র গণতান্ত্রিক বিরোধী পক্ষের ভূমিকা পালন করছে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবিতে মালিকদের যে আন্দোলনে সাংবাদিকদের নিরপেক্ষ প্রতিবেদন রচনার কোনও স্বাধীনতা দেয় না। সিঙ্গুর বিষয়ক প্রতিবেদন আবার তা নতুন করে প্রতিপন্ন করল।